চাষের ভাষা, চাষির ভাষা : প্রসঙ্গ ধান ও পান (হাওড়া, প. ব.)

উত্তম পুরকাইত

সচরাচর ভাষা নিয়ে আমরা যথেষ্ট আবেগ দেখাই। কার্যক্ষেত্রে আমাদের ভাষা সচেতনতা দিন দিন তলানিতে এসে ঠেকছে। বিশেষত আমাদের পরিচিত জনসমাজের মধ্যে ভাষা কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে আমরা তার চর্চায় উৎসাহ দেখাই না। সময়ের সাথে সাথে ভাষা সংযোগের কোড অথবা মিডিয়াম গুলি শুধু বদলাচ্ছে না সমাজ সংগঠন ও তার সমাজমনস্কতাকে পর্যন্ত বদলে দিচ্ছে। আবার কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে অথবা যেতে বসেছে কত ভাষিক উপাদান তার ইয়াত্তা নেই।

বস্তুত ভাষা সংগঠনের যেমন স্থানিক বা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আছে তেমনি সামাজিক বৈচিত্র্যও আছে। অনেক ক্ষেত্রে সমাজ সংগঠনের বৈচিত্র্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে ভাষা সংগঠন। বস্তুত ভাষা সংগঠন ও সমাজ সংগঠন উভয়েই গতিশীল; পরিবর্তনশীলতা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবু এই দুই সংগঠনের গভীর আন্তঃসম্পর্ক আছে। সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই আন্তঃসম্পর্কে ভাষা সংগঠন সমাজ সংগঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বিচার করা হয়। ভাষা সংগঠনের মূল সূত্র দুটি সংযোগ(কমিউনিকেশন) ও মাধ্যম(মিডিয়াম)। এই দুই সূত্রের দ্বারা সমাজ সংগঠনের যেকোনো ধারাকে বিশ্লেষণ ও তার ভাষা কোডগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব।

সমাজ সংগঠনের জীবিকাগত বৈচিত্র্য নির্ভর করে উৎপাদন সম্পর্কের উপর। কৃষি উৎপাদনকে ভিত্তি করেই আদিম কৌম গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে বৃহৎ একটি সমাজ সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সন্দেহ নেই যা কৃষক সমাজ নামে পরিচিত। ভারতীয় সভ্যতায় কৃষিব্যবস্থা বা হলকর্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক বেদে। ঋক বেদের দশম মণ্ডলে 'ইন্দ্র' স্তোত্রে কৃষিকাজে ব্যবহৃত সীতা (লাঙলের ফলা) ও হলকর্ষণের দ্বারা মৃত্তিকাকে জারিত করার দেবতার কথা বলা হয়েছে। সেই প্রাচীন কাল থেকেই কৃষক সমাজ কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি ও উৎপাদন সামগ্রীগুলিকে ভাষা সংগঠনের মিডিয়ামের সাহায্যে নানা ভাষা কোডে চিহ্নিত করে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে আসছে। এক একটি

জনগোষ্ঠীর ভাব বিনিময়ে সাহায্য করেছে তাদের ভাষা সংগঠনের কমিউনিকেশন বা ভাষা সংযোগ। আর এভাবেই একই উৎপাদন সম্পর্কে গড়ে ওঠা সমাজ সংগঠন ভাষা সংগঠনের ভিন্নতার কারণে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আবার একই ভাষা সংগঠনের অন্তর্গত সমাজ সংগঠন ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্যের কারণেও আলাদা হতে পরে। আঞ্চলিক পার্থক্যের কারণে বদলে যায় ভাষা সংগঠনের ভিতরকার ভাষা কোড। ভাষার মিডিয়াম ও কমিউনিকেশন দুই-ই বদলে যেতে পারে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানে যেকোনো সমাজ সংগঠনে ভাষা সংগঠনের প্রভাব বিশ্লেষণে ক্ষেত্রসমীক্ষা অপরিহার্য। কারণ ভৌগোলিক পার্থক্যে সমাজ সংগঠনের ক্রিয়া-কর্ম, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার যেমন বদলে যায় তেমনি বদলে যায় ভাষা সংগঠনের সংযোগ ও মাধ্যমগুলি। সেক্ষেত্রে একই ভাষা সংগঠনের অন্তর্গত নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সমাজ সংগঠনের ভাষা কোডগুলিকে সংগ্রহ করে তাদের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। তাছাড়া সমাজ সংগঠনের ভাষা সংযোগের বৈচিত্র্য গুলিও বিচার্য।

মহাভারতের কাল থেকেই বঙ্গাল দেশ ম্লেচ্ছের দেশ হিসাবে পরিচিত। কারণ বঙ্গাল দেশের আদি জনবাসী আদি ভারতীয়। আদি ভারতীয় জনগোষ্ঠী কৌম সমাজের নিয়ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে স্বতন্ত্র। পাল ও সেন রাজত্বে একটা বৃহত্তর সমাজের চেহারা পেলেও বাঙালি জাতির গঠন দীর্ঘ সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে। সমগ্র মধ্যযুগ ধরে বাঙালি সমাজ সংঠনের পরিপূর্ণতায় বাঙালির সংস্কৃতি ও ভাষার বিশেষ অবদান আছে। বাঙালির সমস্ত সংস্কৃতি তার উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। এই উৎপাদন সম্পর্কের কারণেই বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে ধান ও পানের সম্পর্ক নিবিড়। কারণ নিম্নবঙ্গের প্রধান কৃষিজ ফসল ধান ও পান। এই উৎপাদন সম্পর্ক থেকেই গড়ে ওঠে দুটি সমাজ সংগঠন ধানচাষি ও পানচাষি। আবার ভাষা বা বুলি ছাড়া কোনো সমাজও গড়ে উঠতে পারে না।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর *কাজের বাংলা* বইয়ে "কথা আর কাজ" প্রসঙ্গে বলেছেন-" মিলে মিশে কাজ করার জন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই নাম সমাজ। তার জন্যে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা দরকার, মন জানাজানি হওয়া দরকার। নইলে কোনো কাজই করা যায় না।.... বোঝানো আর জানানোর কাজটা সবচেয়ে ভাল হয় মুখে বললে। সমাজের কাজে লাগবে বলেই ভাষার দরকার পড়েছে। সমাজ যদি না থাকতো ভাষা থাকতো না। তেমনি ভাষা যদি না থাকতো, সমাজ গড়া সম্ভবই হতো না।"

অন্যত্র বলেছেন-" ভাষা যেমন সমাজকে ধরে রাখে, মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়... তেমনি আবার ভাষার ওপর ভর করে সমাজও এগিয়ে যায়।" ('জীবনের ছাপ, অক্ষরে অক্ষরে')।

আমরা সমগ্র নিম্নবঙ্গ নয়, হাওড়া জেলার ভৌগোলিক পরিসরে ধান ও পান চাষিদের ব্যবহৃত ভাষা কিভাবে তাদের সামাজিক সংগঠনে বেঁধে রেখেছে তা পর্যালোচনা করব।

দুই

পুরাণের লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা বাংলাদেশের উৎপাদন সম্পর্কে ধান্যলক্ষ্মী ও অন্নদাত্রীতে পরিণত হয়েছেন। বাংলার ঘরে ঘরে ধান্যলক্ষ্মীর পুজা হয়। ধানের গোলাতেই মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। গোলায় একবার ধান তোলা হলে লক্ষ্মীপুজো না করে ধান নামানো হয় না। বাংলার প্রধানতম খাদ্যও ভাত। বাউণ্ডুলে ছেলেটি ভবিষ্যতে ঘরে ভাত যোগাতে পারবে না বলেই তো লক্ষ্মীছাড়া। তাই—হাতে না মেরে পাতে/ভাতে মারার প্রবাদ আছে বাংলা ভাষায়। বাঙালির সংস্কৃতিতে ভাতের প্রভাব এতটা যে শিশুর মুখেভাত অনুষ্ঠানটি অন্নপ্রাশন নামে পরিচিত। আমরা তাই প্রথমত ধান চাষিদের কথাই বলব। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই কিছুনা কিছু ধান চাষ হয়। হাওড়া জেলার সদর-মহকুমার শিল্পাঞ্চলটুকু বাদ দিলে জেলার প্রায় সমস্ত অংশেই ধান চাষ হয়।

বর্তমানে শিল্পাঞ্চল কিছু বাড়লেও এখনো হাওড়া জেলার মোট জনসংখ্যার তিন ভাগেরও বেশি মানুষ ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার ধানচাষিদের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভাষা বৈচিত্র্য অনুসারে প্রথমত আলাদা করে নেওয়া হবে। ভাষা বৈচিত্র্যের প্রথমেই আসে রেজিস্টারের কথা। প্রসঙ্গ ও প্রতিবেশের পার্থক্যে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তনকেই বলে রেজিস্টার। আগে তাই ধান চাষে ব্যবহৃত ভাষার শব্দ বৈচিত্র্য গুলি দেখে নেওয়া জরুরি-

বন্দ (একবন্দে)	লকতে/লফতে (একলফতে)	খেত (খেত-খামারে)	জমি (জমি-জিরেত)
পোড়ো (পোড়ো জমি)	আচোটা (আচোটা খেত)	মরসুম (ভাল মরসুম)	আবহাওয়া (মন্দ আবহাওয়া)
মাঠ (দক্ষিণ মাঠ)	জলা (জলা-জমি, নীচু জমি)	আল /আটোন (আটোন ছাঁটা/ছাঁদা)	হিড় (হিড় ভাঙা)
ডহর (ডহর জমি)	ডুবো /নাবাল (ডুবো খেত)	চড়া (চড়া মাঠ)	উঁচু (উঁচু মাঠ)
চাষ (একচাষ)	চষা (লাঙল-চষা)	হাল (হাল-ধরা)	লাঙল (লাঙল-চষা)
মই (মই দেওয়া)	চালা (মাটি চালা)	গাছ (গাছ-দড়ি)	গাছা (এক-গাছা)
বীজ (বীজ-তলা)	দানা (দানা-শস্য)	বেওন (বেওন/বীজ-ধান)	আগ (আগ-ধান)
বোনা (বীজ-বোনা)	ছড়ানো (ধান-ছড়ানো)	তলা (কাঁকড়ি-তলা/ পেকে তলা)	চারা (ধান-চারা)
ভাঙা (তলা-ভাঙা)	তোলা (চারা-তোলা)	রোপন (চারা-রোপন)	রোয়া (ধান-রোয়া)
বাড় (বেড়ে-ওঠা)	ঝাড়া (ঝাড়া-মারা)	পাই (পাঁচ-পাই/সারি)	সার (সার সার/সারি সারি)
নিড়ানি (নিড়ানি দেওয়া)	বাছা (ঘাস বাছা)	খোয়া (খোয়ানো/ঘাস তোলা)	ধরা (ঘাস ধরা)
ডগা (ডগা পর্যন্ত)	আগা (আগা-গোড়া)	বিষ (বিষ দেওয়া)	কীটনাশক (কীটনাশক ছড়ানো)
ব্যান (ব্যান গজানো)	গোছ (গোছ বৃদ্ধি)	গোছা (এক গোছা)	মুঠো (মুঠো খানেক)
থোড় (থোড় আসা)	গর্ভ (গর্ভ হওয়া)	দুধ (দুধ বসা)	চাল (চাল ধরা)
মরা (মরে- ঝরে)	হাজা (মরা-হাজা)	বৃষ্টি (ঝড়-বৃষ্টি)	জল (জল-ঝড়)

ছাতা (ছাতা পড়া)	ভেবনো/ভাবনো (ভাবনো ধরা)	ডাবা (তিন ডাবা)	মেজলা (মেজলা ভর্তি)
নালা (খাল-নালা)	নাশা (নাশা-কাটা)	মজুর (ক্ষেত-মজুর)	জন (জন-মজুর)
বস্তা (এক বস্তা)	থলে (থলে ভরা)	ধামা (এক ধামা)	এদে (এক এদে)
পালা (পালা দেওয়া)	সারা (ধান সারা)	গাবা (গাবা মারা)	গর্ভ (গর্ভ ভরা)
ভানা (ধান ভানা)	কোটা (চাল কোটা)	ভাপানো (ধান ভাপানো)	সিদ্ধ (ধান সিদ্ধ)
শুকনো (ধান শুকনো)	মেলা (ধান মেলা)	পিঠ (একপিঠ)	পা-চালা(পা-চালা মারা)
কাঁড়ি (কাঁড়ি ভাঙা)	গাদা (ধানের গাদা, খড়ের গাদা)	আগড় (আগড় পাতা)	পাটা (পাটা তোলা)

- কাঁকড়ি তলা = শুকনো মাটিতে বীজ ধান ছড়িয়ে যে তলা/চারা করা হয়।
- পেকে তলা = অঙ্কুরিত বীজ ধান পাঁকে/কাদায় ছড়িয়ে যে তলা/ চারা করা হয়।
- খোয়া/খোয়ানো = তলা রোপন বা রোয়ার সময় জলে ভাসা ঘাস বা আবর্জনা সাফ করা।
- ব্যান (তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়) ১ম = চারা বা তলা। ২য় = মূল চারা গাছের পাশ থেকে নতুন গাছ গজানো। ৩য় = বীজ ধান/বেওন ধান।
- থোড় = ধানের শিস বেরনোর আগের অবস্থা বা গাছের দেহে শিসের আগমন বা গর্ভাধান হওয়া।
- দুধ বসা = ধানের ফুল থেকে ফলে পরিণত হওয়ার প্রথম অবস্থা।
- এদে = বেতের বোনা বড়ো ধামা বিশেষ।
- গাদা = গাছধান বা গাছধান ঝাড়া খড় গাছিয়ে বা গুছিয়ে সাজানো।
- আগড় = বাঁশ দিয়ে বানানো দরজা বিশেষ, ঘরের দরজা ও ধান ঝাড়া দুই কাজেই ব্যবহৃত হয়।
- পাটা = বাঁশের বোনা পাটাতন বিশেষ, কেবল ধান ঝাড়ার কাজেই ব্যবহৃত হয়।
- গাবা = ধানের কাঁড়ির মাঝের ফাঁকা অংশ।
- ভানা = ভাঙা। ধান ভাঙা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- কোটা = ভাঙা। চাল ভাঙা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- আচোটা = যে জমিতে আঁচোড় কাটা বা কর্ষণ করা যায় নি।
- নাবাল = নীচু জলাজমি অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- পালা = কুলোর হাওয়ায় ধান থেকে চিটে কুটি সাফ করা।

তিন

এবার আসা যাক বাক্য বৈচিত্র্যের কথায়। প্রসঙ্গ ও প্রতিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত শব্দগুলি বাক্যে কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা দেখা যেতে পারে।

প্রসঙ্গ : চাষবাসের খবরাখবর সংক্রান্ত :

১ম চাষি; এবার ক'বিঘে চাষ করবি ঠিক করিচিস ?

২য় চাষি; পাঁচ বিঘে, তাও **বন্দে বন্দে**। দু'বিঘে দক্ষিণ মাঠে, তিন বিঘে পুবের মাঠে।

১ম চাষি; আমার ভাই চার বিঘে **একলকতে**। এমাঠ-ওমাঠ করতে হবে না।

প্রতিবেশ বা সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে : অতিবর্ষণ

১ম চাষি; তোর আর চিন্তা কি ? ভাদুরে **চড়া**, ডোবা-হাজার ভয় নেই।

২য় চাষি; সে তো দক্ষিণ মাঠের দু'বিঘে। পুবের মাঠের তিন বিঘেই তো **ডহর**। ব্যাঙে মূতলেই ডোবে। এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। **কাঁকড়ি তলা** আর হবে না। **পেকে তলা** ফেলা ছাড়া উপায় নেই।

প্রসঙ্গ : চাষ দেওয়া বা চাষে নামা

১ম চাষি; এবার তো **জো** হয়েছে, তা চাষ দিবি কিসে ? **হাল** করবি, না ট্রাক্টর দিবি?

২য় চাষি; দুর। **হাল** করা বেকার। **লাঙল চষার** দিন শেষ। ট্রাক্টরে **একচাষে** যা হবে, লাঙলে **দু'চাষেও** তা হবে না।

প্রতিবেশ বা সামাজিক পরিস্থিতির বদল : চাষের খরচ বা আর্থাভাব

১ম চাষি; গত বছর যা গেল ! **বেওন** ধানও রাখতে পারিনি। পেটের খরচ যোগাব, না **বীজ** ধান কিনব।

২য় চাষি; আগ ধানে আর আগের মতো ফসল হয় না। নতুন ধান চাষ করাই ভাল। ধানের যা দাম ! তবে যাই বলিস, কেনা ধানে একটা **চিটে** থাকে না।

প্রসঙ্গ : চারা রোপন / ধান রোয়া :

১ম ক্ষেতমজুর; বিঘে প্রতি ছ'জনের কমে রোয়ার **ফুরোন** নিবি না। পাঁচ জনে হয় নাকি?

২য় ক্ষেতমজুর; পাঁচ জনে মাতায় মাতায়। কিন্তু কি করব। ছ'জনে রাজি হল না তো। তবে ন'টার মধ্যে **তলা ভাঙা** হয়ে গেলে, একটু হাত চালালে দু'টোর আগেই মেরে দেবো। একেবারে **চৌপুরি** করে বাড়ি যাব।

প্রতিবেশ বা পরিস্থিতির বদল : পোকার আক্রমণ

১ম চাষি; একতো **হদ** পড়ে বুজে ছিল। তারপর **নিড়ুনি** দিতে যেই গাছ একটু **ঝাড়ল/ঝাড়া মারল** অমনি মাজরা পোকায় **মেতি** কাটতে শুরু করল !

২য় চাষি; আমিও দুবার **বিষ** দিয়েছি। আমার জমির অবস্থাও একই। একবার **ধসা** একবার **মাজরা** কি আর ফসল হবে ?

- জো = ধান চাষের উপযুক্ত সময়। চাষিদের কথায় জো ধরতে না পারলে ফসল মার খাবেই।

- বিঘে = বিঘা, কুড়ি কাটায় এক বিঘা।
- নিড়ুনি = নিড়ানি, আগাছা পরিস্কার করা।
- হদ = জলজ শ্যাওলা বিশেষ। আমন ধান রোয়ার পর হদ পড়ে গেলে ধান গাছ কিছুতেই সারে না।
- ফুরোন = চুক্তি করা। কোন কাজের জন্য কত জন মজুর নেওয়া হবে তার চুক্তি।
- চৌপুরী/চৌপর = চার প্রহর (১২ ঘণ্টা, বর্তমানে আট ঘণ্টা)। দুবেলা কাজ না করে সকাল থেকে একটানা আট ঘণ্টা কাজ করা।
- চিটে = অপরিপক্ক শুকনো ধান। দুধ বসার আগেই যে ধান শুকনো হয়ে গেছে।
- মেতি = ধান গাছের আগা বা ডগা।
- ধসা = এক ধরনের রোগ। ধান গাছের গোড়ায় পচন ধরলে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। একেই ধসা রোগ বলে।
- মাজরা = এক ধরনের পোকা। ধান গাছের মেতি বা আগা কেটে দেয়।

চার

বাক্য বৈচিত্র্যর আর উদাহরণ না বাড়িয়ে এবার আমরা পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারি। শুধু শব্দ বা বাক্য নয়, হাওড়া জেলার ধান চাষিদের কাজ-কর্মের একটি প্রতিবেদন যদি তৈরি করা যায় তা থেকেও চিহ্নিত করা যাবে তাদের ভাষা কোড বা ভাষা সংযোগের মাধ্যম গুলি। একটি প্রতিবেদন-

"ভোর থেকে বিনোদের **খামারে** ধান ঝাড়া শুরু হয়েছে। কাল সন্ধে থেকে **পাটা** পাতাই ছিল। সকালে **ভুঁড়** বেঁধে পাটা উচুঁ করা হয়েছে। **দু'তড়পা** করে চার **তড়পা** খড় উল্ট করে বেঁধে দু'দিকে দুটো ভুঁড় দেওয়া হয়েছে। ফলে, রাধে ও জগা তিন **জন মজুর** পেয়েছে বিনোদ। শিশিরে ভেজা কাঁড়ির চালের খড় সরিয়ে একটা **তাগাড়** নামানো হয়েছে। দশটার মধ্যে তিন তাগাড় ঝাড়তে না পারলে সন্ধের আগে ধান, **খড়, কুটি, চিটে** সরানো যাবে না। খড়ের **গাদা** দিতে হবে। চিটে কুটি গাছ তলায় জড়ো করে দিতে হবে। যাতে হাওয়া পেলে **চিটে ধরানো** যায় সহজে। **ঝাঁটা, কুলো, ধামা, বস্তা, ছোট, দড়ি, গুণছুঁচ, বিঁড়ে** সমস্ত যোগাড়-জাত করে রেখেছে বিনোদের বৌ।

এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত মোটা অক্ষর গুলি হাওড়া জেলার ধান চাষিদের ব্যবহৃত ভাষা কোড। এই একই ধরনের প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিম রাঢ়-এর ধান চাষিদের নিয়ে লেখা হলে উপরিউক্ত ভাষা কোড গুলিই তাদের ভাষা বৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করে দেবে।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে যেকোনো সমাজ সংগঠনের ভাষা কোডের দুটি রূপ আছে- সংকুচিত কোড এবং বিস্তৃত কোড। ব্যাপারটা

নির্ভর করে সমাজ সংগঠনের ভাষার দক্ষতা ও পরিস্থিতি অনুসারে তাদের ভাষা ব্যবহারের উপর। সাধারণত গ্রাম্য চাষিবাসি মানুষের ভাষার দক্ষতা কম, তাই তাদের ভাষা কোড সংকুচিত হওয়ার কথা। তবে ক্ষেত্র বিশেষে, আঞ্চলিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা, নাগরিকতার প্রভাব ইত্যাদির কারণে ধানচাষিদের ভাষার দক্ষতা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। আবার হাওড়া জেলা কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায়, চাষির বাড়ির ছেলেরাও পড়াশোনা বা কাজের সন্ধানে কলকাতায় যাতায়াত করায়, ছোটখাট শিল্পাঞ্চল কেন্দ্রিক মফস্বল শহর গড়ে ওঠায় এখানকার ধানচাষিদের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাও যখন কথক ও শ্রোতা দুজনেই চাষি তখন তারা সংকুচিত কোডেই কথা বলেন। যেমন জমি সংক্রান্ত বিবাদ প্রসঙ্গে পরিচিত দুই চাষি।

১ম। একেবারে তিন হাত ঢুকছে।

২য়। তবে আর বলচি কি। আমার তো চৌকো জমি। দড়ি ফেলে দেখি দড়ি পুবদিকে ভেতরে ঢুকে আসচে। শালা হিড় ভেঙে ঢুকেছে।

১ম। মানিক সর্দার বড়োলোক। তাও শালার এমন স্বভাব !

২য়। হিড় ভাঙা ওদের রক্তের দোষ। ওই করেই তো ক্ষেত বাড়িয়েছে।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে দুজনের ভাষার দক্ষতা কম বলেই ছোটো ছোটো বাক্যে নিজেদের মনোভাব বোঝাতে চেয়েছে। কথোপকথনটিকে একটু দীর্ঘ করলে শব্দ ও বাক্যের একরূপতা স্পষ্ট হবে। আবার এই পরিস্থিতির কথা ওরা যখন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে অভিযোগ আকারে জানাতে যাবে তখন কিছুটা হলেও ভাষা কোড বিস্তৃত হবে।

- তড়পা = কুড়ি আঁটি খড় একসঙ্গে বাঁধা।
- তাগাড় = একবারে ঝাড়ার পরিমান মত গাছধান।
- ভুঁড় = চার তড়পা খড় আগা-গোড়া করে বাঁধা হয় (ভুঁড়), পাটা বা আগড় উঁচু করে রাখার জন্য।
- ছোট = খড়ের পাকানো দড়ি।
- বিঁড়ে = ছোট দিয়ে পাকানো বেড়ি।
- কুটি = ভাঙা খড়ের অংশ।
- চিটে ধরানো = চিটে, খড় ও ধান আলাদা করার জন্য বাতাসের বিপরীতে চিটেধান ধীরে ধীরে ছড়ানো।
- হিড় = আল বা আটন। হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমের বাগনান ও শ্যামপুরের চাষিরা বলে থাকেন।

ভাষারীতি বা বাকভঙ্গি ভাষা বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। ভাষাবিজ্ঞানী আরভিন-ট্রিপ হাইমসের মতে বাকভঙ্গির সর্বসম্মত রূপ তিনটি- (ক) চলতি রীতি(colloquial) (খ) বিনম্র বা বিধিগত রীতি (formal or polite) (গ) অপভাষিক রীতি (slang or vulgar)। একই সমাজ সংগঠনের অন্তরভূক্ত হয়েও বাকরীতির এই বৈচিত্র্য হয় বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্ক অনুসারে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পার্থক্য অনুসারে। উৎপাদন সম্পর্কে হাওড়া জেলার ধানচাষিরা একই ভাষা কোড ব্যবহার করেও এই বাকরীতির সাহায্যে নিজেদের স্বাতন্ত্রতা বুঝিয়ে দিতে পারেন। যেমন—

(ক) চলতি রীতি(colloquial) - (দুই গরিব নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষত ক্ষেতমজুরের কথনভঙ্গি)

প্রসঙ্গ : ধান ঝাড়া

প্রথম মজুর : শীতের ব্যালা যাই যাই করচে, সুযজো ডুবলে কুলো দিবি কখন **খড় বাঁদবি** কখন আর গাদাই বা কখন দিবি?

দ্বিতীয় মজুর : ব্যালা এখন ঢের আচে, ক'**গজ** আর হবে এক **ঝোঁক** দিলে ঝাড়া শেষ। পাটা সইরে তুই ঝাঁট দিবি, আমি ভুঁড় চারটে ঝেড়ে নোব। দু'জনে এক সঙ্গে কুলো ধরলে ধান সারতে কতক্ষণ। দু'জনে খড় বাঁদবো, তুই তড়পা ধরাবি আমি গাদা দোব।

(খ) বিনম্র বা বিধিগত রীতি(formal or polite)-(দুই সম্পন্ন শিক্ষিত চাষির কথনভঙ্গি)

প্রসঙ্গ : চাষ-বাস

প্রথম চাষি : কথায় বলে—**মাদার** ধান বাঁধা। বাণ-বন্যা যাই হোক ধান যা হবার তাই হবে। পোকা-মাকড়েও কিছু ক্ষতি করতে পারে না। গেল বছর দক্ষিণ মাঠের চড়ায় বিঘেখানেক দিতে পেরেছিলুম, শ্যামা ঘাসে বুজে গেলেও ধান পেয়েছি বারো **বস্তা**।

দ্বিতীয় চাষি : জানি রে ভাই সব জানি। কিন্তু আবহাওয়া কি আর আগের মতো আছে, যে কাঁকড়ি তলা ফেলবো, **মাদা** দেবো। যখন বৃষ্টি হচ্ছে তো একেবারে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আমার তো আবার সব জমিই ডহর।

(গ) অপভাষিক বা অশিষ্ট রীতি (slang or vulgar)

১. একে **কাদা করা** বলে, শালা ফনে (ফনিন্দ) হাল মারিয়েছে না (ধন) ঘষেছে ?

২. রাখতো শালা তোর বোয়ের কথা, ধান ভানতে শিবের গীত।

৩. লক্ষ্মীকান্ত মাস্টার হলে কিহবে, স্কুলে গিয়েও চাষের গল্প। সাধে কি আর বলে- ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

- মাদা = শুকনো জমিতে আট বা দশ ইঞ্চি ছাড়া গর্ত করে ধান বোনা। খত বা ছাই চাপা ধান এক পশলা বৃষ্টি পেলে চারা গাছে পরিণত হয়।
- বস্তা = দেড় মণ বা ষাট কেজি ধানকে এক বস্তা পরিমাণ ধরা হয়।
- খড় বাঁধা = কুড়ি আঁটি করে খড় এক সঙ্গে বাঁধা বা তড়পা বাঁধা।
- ঝোঁক = একটানে যতটা করা যায়।
- কাদা করা = হাল বা লাঙল দ্বারা মাটিকে তলা রোপনের উপযোগী করে তোলা।
- গজ = এক হাতের পাঁচটি আঙুলের ফাঁকে যত গুলি খড়ের আঁটি ধরে।

ছয়

এবার আসা যাক দ্বিবচনের (diglossia) কথায়। ভাষাবিজ্ঞানী ফার্গুসেন দ্বিবচন বলতে বুঝিয়েছেন একই ভাষার দুই বুলির সমাজ নির্দিষ্ট বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহারকে। মোটামুটি ভাবে ভাষার বুলিকে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে উচ্চ-বুলি ও নিম্ন-বুলি এই দুই শ্রেণিতে ফেলা যায়। প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে শব্দ বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে অনেক গুলি দ্বিবচনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ভাষা ব্যবহারকারী সমাজ পরিবেশ অনুসারে উচ্চ-বুলি নিম্ন-বুলি নির্ধারণ করে থাকে। যেমন ধানচাষিদের কাছে-

উচ্চ-বুলি	নিম্ন-বুলি	উচ্চ-বুলি	নিম্ন-বুলি
ক্ষেত/ভূমি	জলা/জমি	কৃষক/কৃষাণ	চাষি/চাষা
শস্য/বীজ	ফসল/দানা	সেচ/সেচন	ছেঁচ/ছেঁচা
রোপন	রোয়া	নাশা	নালা
অঙ্কুর	কলা	উঠান	বাকুল
ভোর	ঝুঁজকো	গৃহস্থ	ঘরোয়া
সিঁথি/সিরুলি	সিতে	পতিত	আচোটা
আবাদ	চাষ	শালি	জলা
মৃত্তিকা	মাটি	ক্ষত	ছাই

সাত

হাওড়া জেলার ধান চাষিদের হারিয়ে যাওয়া কিছু শব্দের উল্লেখ করে ধান চাষের প্রসঙ্গ শেষ করব। যেমন-

- লেদ = নীচু জমিতে আমন ধান চাষের সময় এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে তলা বা ধান চারা জলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তলার আঁটি গুলিকে সারিবদ্ধ ভাবে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া।
- ত্যাড়া = তিন সাড়ে-তিন ফুটের দুটি শক্ত বাঁশের লাঠি। নীচু জমিতে ধান পেকে

গেলেও মাঠের জল শুকনো হয় না। তখন জলের মধ্যেই ধান কাটা হয়। বাঁশের লাঠি দুটোয় গাছ ধান সাজিয়ে দুজন দুদিকে ধরে ধান বাঁধে (বা উঁচু জমিতে) তোলা হয়।

- ছিউনি = টিনের তৈরি তেকোণা ঠোঙার মত যন্ত্র বিশেষ। দুদিকে দুটো করে দড়ি লাগিয়ে দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে জলসেচ /ছেঁচা হয়। হাওড়া জেলায় ডোঙা অপেক্ষা ছিউনির ব্যবহার বেশি। এখন অবশ্য পামসেট সেচের কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়।
- পেখে/পেকে = তালপাতা দিয়ে বানানো ঠোঙার মত, মাথায় দিলে বৃষ্টিতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকত। শ্রাবণের ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে পেকে মাথায় দিয়ে চাষিরা মাঠের কাজে যেত।
- পোলমাড়া = খড়-কুটি থেকে ধান বের করার জন্য খামারে একটি খুঁটিতে তিন-চারটে গরু বেঁধে খড়-কুটির উপর ঘোরানো হত। যাদের গরু নেই তারা রাস্তায় খড়-কুটি বিছিয়ে দিত,যাতে পথযাত্রীদের দ্বারাই পোলমাড়ার কাজ হয়ে যায়।
- লাঠি দেওয়া = চড়া জমির আমন ধান একভাবে কাটার জন্য লাঠি দিয়ে ধান গাছ একদিকে শোয়ানো হত।
- গোছ = একটি মাদা বা রোপন করা এক একটি চারা ও তা থেকে গজানো গাছের সমষ্টি।
- হালা = ধান কাটার সময় সাধারণত তিনটে বা চারটে গোছ নিয়ে এক মুঠো পরিমান গাছ। দু হালা এক আঁটি।
- টাল = খড়ের তড়পা গুলিকে বিশেষ প্রকারে সাজিয়ে ছোটো দোচালা কুঁড়ে ঘরের মত করে রাখা, যাতে খড়ের মধ্যে জল ঢুকে খড় নষ্ট না হয়।
- পাছড়ানো = কুলোয় করে চাল থেকে কুঁড়ো, খুদ আলাদা করার পদ্ধতি।
- চাখা = শুকনো ধান উপযুক্ত তাপ পেয়েছে কিনা দাঁতে ফেলে দেখা। চাখা ভুল হলে চাল গুঁড়িয়ে খুদ হয়ে যাবে, নয়তো চালে আড়া থেকে যাবে।
- আড়া = ধান ভাঙা বা ছাঁটার পর ধানের ত্বক ভালোভাবে ছাঁটা না হলে আড়া চাল বলে।
- বিউনি = মকর সংক্রান্তিতে এক গোছা ধানের শিষ বিনানো হয়। এই বিউনিকেই ছড়া বলা হয়। ধানের গোলা, লক্ষ্মীর বেদীতে এই বিউনি বা ছড়া রাখা হয়।
- মকর চাল = ধান কাটার শেষে জমির এক কোণায় তিন গোছ ধান গাছ রেখে দেওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনে আতোপ চাল, ডাবের জল, গুড় বা চিনি দিয়ে গুলে তাতে শশা, সাঁকালু, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে ক্ষেত বাড়ানোর প্রার্থনায় মাঠে পূজা করা হয়। এ পূজায় ব্রাহ্মণ লাগে না। এই পূজার চাল মকর চাল।

- নাড়া = ধান গাছের গোড়ার মোটা অংশ।
- গোড়ে বোঝা = এক জোড়া ছোট বা দড়ি ফেলে তার উপর নাড়া সাজিয়ে গোল করে পাকানো বোঝা।
- জুলি = জমে থাকা জল কাটানোর সরু পথ। পথের ধারে ধারে যে সমস্ত খাতে জল জমে থাকে তাকে বলে নয়ান জুলি।
- ছাঁকা = নীচু জমি থেকে পাকা ধান কেটে ডাঙায় তোলা।

পান/পানচাষি

কৃষি উৎপাদনমূলক সমাজ সংগঠন হিসেবে ধানচাষিদের অপেক্ষা পানচাষিদের বিচরণক্ষেত্র সীমিত। ভাষা সংগঠনের বিচারেও ধানচাষিদের-বুলির মধ্যে যেমন একটা সর্বজনীন ঐক্য আছে পানচাষিদের মধ্যে তা নেই। অঞ্চলবিশেষে পানচাষিদের ভাষা সংযোগ ও তার কোড গুলির পার্থক্য যথেষ্ট। প্রথমত একই ভাষা অঞ্চলের সর্বত্র পান চাষ হয় না। হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে। তাই ভাষার স্থানিক রূপকে ভিত্তি করেই পানচাষিদের ভাষা-সংযোগ গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত পান দীর্ঘকাল জাতীয় ফসলের স্বীকৃতি না পাওয়ায় তার চলাচলের ক্ষেত্র এত সীমিত থেকে গেছে যে বিভিন্ন অঞ্চলের পানচাষিদের বুলি বা ভাষার সমন্বয় সেভাবে না ঘটায় ভাষা সংযোগের কোড গুলির ধ্বনি ও রূপগত বিবর্তন বিশেষ ঘটে নি। তাই আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভাল হাওড়া জেলার পানচাষিদের ভাষা বিচারে হাওড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের স্থানিক ভাষা কোড গুলির কথাই এখানে উল্লেখ করা হবে।

ভারতবর্ষের সর্বত্র পান চাষ না হলেও পুরাণের নাগবল্লী বা পানগাছের সঙ্গে ভারতীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতির দীর্ঘ যোগসূত্র আছে। প্রাচীনকাল থেকে যেকোনো সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক শুভ কাজে পানকেই সাংস্কৃতিক সংযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পূজা-পাঠ থেকে বিবাহ, রাজ্যাভিষেক থেকে মন্ত্রীদের বরণ সব কাজেই পান মঙ্গলসূচক। মুসলমান সমাজেও পানের সমান সমাদর। সুলতান, বাদশাহ বা নবাব সব আমলেই মন্ত্রী, সেনাপতি, সুবেদার, মনসবদার, দেওয়ান প্রমুখের নিয়োগের ক্ষেত্রে **পান** দানের কথা বলা হয়েছে। আবার মুসলমান সমাজে পারিবারিক ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর পাকাদেখা **পান-চিনি** নামে পরিচিত। স্বভাবতই ভারতীয় তথা বাঙালির সমাজ সংগঠনে পানচাষিদের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

কথিত আছে পুরাকালে সমুদ্রমন্থনের সময় ওঠা অমৃতের এক ফোঁটা পাতালে পড়ে গেলে নাগবল্লী লতা সৃষ্টি হয়। অমৃত জাত বলেই এই লতা ওষধি পত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। লতা জাতীয় এই গাছের ফুল-ফল সচরাচর হয় না। প্রবাদ আছে পানের ফুল দেখলে রাতারাতি ধনী হওয়া যায়। লোকপুরাণে আবার পানের ফুল-ফল না হওয়া নিয়েও কিংবদন্তি আছে। সেই কিংবদন্তি অনুসারে পান বিষ্ণু কন্যা। শিব-দুর্গার পুত্র

কার্তিকের সঙ্গে তার বিবাহের কথা ছিল। কার্তিক বিবাহ যাত্রাকালে মাঙ্গলিক যাঁতি সঙ্গে নিতে ভুলে যান। দুর্গা কুক্কুরী রূপ ধরে পুত্রের কাছে যাঁতি পৌঁছে দিতে গেলে শুভ কাজে বাধা দেওয়ার জন্য কার্তিক কুক্কুরীকে প্রহার করেন। পরে যাঁতির কথা মনে করে ঘরে ফিরে দুর্গার কাছে তাঁকে প্রহারের কথা জানতে পেরে কার্তিক লজ্জিত হন এবং বিবাহ বাসনা পরিহার করেন। তাই কার্তিক ও বিষ্ণুকন্যা অনূঢ়া থেকে যান। লোকসমাজে কার্তিক তাই আইবুড় এবং পান কুমারী লতা হিসেবে পরিচিত। এই কিংবদন্তি থেকেই বোধহয় পানচাষিদের মনে এমন সংস্কার দৃঢ় হয়েছে যে, রজঃস্বলা বা ঋতুধারণ কালে কোনো নারীর পানের বরজে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাস্তবিক এ সমস্ত সংস্কার অতীতে মেনে চলা হলেও এখন আর পানচাষিরা সেভাবে মানেন না।

যাইহোক, পানপাতা নেশার দ্রব্য হিসেবেও গণ্য হয়। এখনও পান প্রধানত নেশা জাতীয় খাদ্য-বস্তু হিসেবেই ব্যবহৃত। চাষিদের কাছে অর্থকরী ফসল। গ্রামে গ্রামে যখন ব্যাঙ্ক বলে কিছু ছিল না তখন পানচাষিদের বলতে শোনা গেছে, পানের বরজে গচ্ছিত পাতাই তো তাদের ব্যাঙ্কের টাকা। পাতা ভাঙো আর বাজার থেকে টাকা আনো। উৎপাদন সম্পর্কে ধান যেমন গৃহলক্ষ্মী পান তেমনি পণ্য বা বাণিজ্যলক্ষ্মী। কৃষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় পানচাষিদের সামাজিক মর্যদা অর্থকৌলীন্যে বেশ উচুঁদরেরই ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এদের সমাজ সংগঠনের দুটি রূপ আছে- পানচাষি ও পান ব্যবসায়ী। পানচাষি অপেক্ষা পান ব্যবসায়ীদের ভাষা-কোড উচ্চমানের। পানচাষের জন্য পান বরজ নির্মাণ করতে হয়, তাই আদি পানচাষিরা বারুই সমাজ নামে পরিচিত হত। বাংলার ইতিহাসে বারুইদের মর্যাদার কথা মুসলমান শাসন কালেও পাওয়া যায়। তবে পান অর্থকরী ফসল হলেও পান ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য পরিধি এখনও সীমিত। চা শিল্পের মত আন্তর্জাতিক বাজার পানচাষিরা পেল না। বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান এর বাইরে পান আন্তর্জাতিক পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি।

দুই

হাওড়া জেলার সর্বত্র পান চাষ না হলেও উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ জুড়ে প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়। হাওড়া, খলিশানি, পাঁশকুড়া ও বজবজের বাজারে এই সমস্ত পান বিক্রি হয়। অঞ্চল অনুসারে হাওড়ার পানচাষিরা-উত্তরের চাষি, পশ্চিমের চাষি ও দক্ষিণের চাষি নামে পরিচিত। শিল্পাঞ্চল গ্রাস করায় উত্তর ও পশ্চিমে পানের বরজ কমে এসেছে, অন্যদিকে দক্ষিণের পানচাষিদের আধিপত্য দিন দিন বাড়ছে। তাছাড়া পাঁকমাটি ছাড়া পান, বিশেষত ঘন গেঁটে বাংলা পান ভাল হয় না। হাওড়া জেলার দক্ষিণের মাটি পাঁক যুক্ত এঁটেল মাটি, যা বাংলা পানের জন্য আদর্শ। মিঠা পানের চাষ হাওড়া জেলায় সীমিত। উত্তরের চাষিরা হাওড়া বাজারে যায় বেশি তাদের ভাষায় আঞ্চলিক ছাপ থাকলেও তা শিষ্ট রাঢ়ির কাছাকাছি। পাঁশকুড়া বাজারে যায় পশ্চিমের চাষিরা তাদের ভাষায় মেদিনীপুরের আঞ্চলিক টান স্পষ্ট। দক্ষিণের চাষিরা যায় খলিশানি অথবা

বজবজের বাজারে, তাদের ভাষা হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক বিভাষার মিলিত রূপ। আমরা মূলত দক্ষিণের পানচাষিদের ভাষা পর্যালোচনা করব। তাই আমাদের আলোচনার সঙ্গে আবদুল জব্বারের লেখা *বাঙলার চালচিত্র* বইয়ে প্রকাশিত 'পান' বিষয়ক রচানার কিছু সাদৃশ্য থাকবে।

ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, লোকগান ভাষার এই সমস্ত উপাদান যে কোনো সমাজ সংগঠনের ঐক্য শক্তি দৃঢ় করে। হাওড়া জেলার পানচাষিদের ভাষা পর্যালোচনায় আমরা প্রথমত ভাষার উপরিউক্ত লোক উপাদনের কিছু পরিচয় নেব। যেমন-

ধাঁধা	আঁক কেটে বাঁক কেটে বসালুম চারা ফুল নেই ফল নেই পাতায় ভরা।
প্রবাদ : চাষের পদ্ধতি সংক্রান্ত-	রোদে ধান ছায়ায় পান।
বৃষ্টির উপকারিতা সংক্রান্ত-	দিনে সারে ধান, রাতে সারে পান।
পানের নেশা সংক্রান্ত-	ভাত বিহনে যেমন তেমন পান বিহনে মরি।
অতি ফলন সংক্রান্ত-	আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়।
প্রবচন : নেশা সংক্রান্ত-	পানের নাম প্রাণ।

লোকগান- এক সময় অংশুমান রায়ের গাওয়া এই গানের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে-

ও খোকার মা, পান খেয়ে গাল পুড়েছে।
এখন তোকে কি করে আদর করি বল
সন্দেহ তুই করিস নারে ভাবিস নারে ছল।।

তিন

হাওড়া জেলার পানচাষিদের ভাষায় শব্দ বৈচিত্র্য বা প্রসঙ্গ ও প্রতিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার কিভাবে হয় আগে তার একটা সারণি করে পরে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-

কাঠ (ঠ্যাং-কাঠ)	বাঁশ (পাকা বাঁশ)	উবি (মোটা উবি)	খুঁটো (লম্বা খুটো)
ফালি (দো-ফালি)	চ্যালা (চ্যালা কাঠ)	চাল (চাল ছাওয়া)	ছাউনি (ছাউনি পাতা)
পিচে (পিচে ফেলা)	খড়ি/শরখড়ি (খড়ি ঝাড়া)	প্যাঁকাঠি/পাটকাঠি (প্যাঁকাঠি সেঁকা)	পাগড়ি (পাগড়ি ধরানো)
জন (জন কাটা)	উলু (উলু বাছা)	ন (ন-ধরা)	গাছ-ধরা (দুদিন অন্তর গাছ-ধরা)
পাই (পাই কোপানো)	সারি (বিশ সারি)	ভাঙা (পান ভাঙা)	নোড়া (পাতা নোড়া)
আড়া (আড়া দেওয়া বা আওড়ানো)	চালা (চেলে নেওয়া)	বাছ (বাছ পান)	খতি (খতি পানের মোট)
ডগলা (মোটা ডগলা)	লগা (সরু লগা)	বোঁটা (লম্বা বোঁটা)	ডোঁপা (ডোঁপা ছাঁটা)
পাকা (কড়ম পাকা)	গাছ (শির গাছ)	ডেঁপি (ডেঁপি ভাঙা)	গেঁজি (গেঁজি বাছা)
বাঁধা (টানা-বাঁধা)	ফেলা (খাড়ি ফেলা)	টানা (খুঁচি টান)	দোলন (গাছ-দোলন)
সাজা (পান সাজা)	খিলি (এক খিলি)	দাগ (টোপা দাগ)	ফুটো (জল ফুটো)
পচা (খাড়ি পচা)	আংরা (গেঁটে আংরা)	জন (জন খাটা)	মজুর (পান ভাঙা মজুর)

- কাঠ = হাওড়া জেলার দক্ষিণের পান চাষিরা পানের বরজ নির্মাণে প্রধানত বাঁশের ব্যবহার করে থাকে। তাই বাঁশকেই এখানে কাঠ হিসেবে ধরা হয়। বাঁশের গোড়ার ফালিকে তাই বলে ঠ্যাং-কাঠ।
- উবি = পানের বরজের চার পাশে বাঁশের অথবা তারের টান দেবার জন্য মোটা বাঁশ বা কাঠের যে খুঁটি বা খুঁটো পোতা হয়।
- পিচে = খড়ি বা শরখড়ি। শুকনো খড়ির গোড়ার পাতা ঝেড়ে পান গাছকে রোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বরোজের চালে বিছানো হয়।
- প্যাঁকাটি বা পাগড়ি = পাট গাছ পচিয়ে আঁশটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাণ্ড গুলোকে শুকনো করা হলে তাকে পাটকাঠি/প্যাঁকাঠি/পাগড়ি বলা হয়। লতা জাতীয় গাছ হওয়ায় পান গাছকে সোজা করে উপরে তোলার জন্য গাছে পাগড়ি ধরানো হয়। প্যাঁকাঠি নরম ও শিশির ধরে রাখতে সক্ষম হওয়ায় পান গাছের শিকড় জড়াতে ও রস পেতে সুবিধা হয়।
- জন = উলু ঘাস কেটে জলে পচিয়ে শুকনো করা হলে তাকে জন বলে। পান গাছকে পাটকাঠির সঙ্গে জড়ানোর জন্য এই শুকনো উলুকে ব্যবহার করা হয়।
- ন-ধরা = পান গাছ দ্রুত বাড়ে। যাতে ঝুলে না পড়ে তাই প্রতি সপ্তাহে জন দিয়ে গাছ গুলিকে পাটকাঠিতে জড়ানো হয়। ছ'ইঞ্চি মাপের জনকে দুই আঙুলের চাপে পাটকাঠি ও পান গাছের মধ্যে জড়ানোর পদ্ধতিকে বলে ন-ধরা।
- পাই = পান গাছ লাগানো হয় সারিবদ্ধ ভাবে। এক একটি সারিকেই পাই বলা হয়।
- ভাঙা/নোড়া = পান পাতা নখের সাহায্যে কেটে নিতে হয়। একে কোথাও পান ভাঙা কোথাও আবার পান নোড়াও বলে।
- আড়া = ভাঙা পান গোছানোর আগে ছোট-বড়ো পান জল ছড়া দিয়ে মেশানো হয়। একে আড়া বা চালা বলে।
- বাছ পান বা খতি পান = পান গোছানো হয় বড়ো থেকে ছোট হিসাবে। কিছু বাঁকাচোরা, দাগি, ছেঁড়া বা ছোট পানকে গোছের সঙ্গে মেলানো যায় না। এগুলি বাছ বা খতি পান। পানের নেশায় আসক্ত দরিদ্র বৃদ্ধ/বৃদ্ধারা এই বাছ পান চাষির বাড়ি থেকে বিনা পয়সায় নিয়ে যান।
- ডগলা/লগা = বাঁশের উপরের সরু অংশ যাকে ফালি করা হয় না।
- বোঁটা/ডোঁপা = পান পাতার বৃন্ত। ঘন গেঁটে বাংলা পানের বৃন্ত ছোট হলেও কালি বাঙ্গাল পানের বৃন্ত হয় দীর্ঘ। তাই মোট সাজানোর সময় বড়ো বৃন্ত ছাঁটতে হয়।
- পাকা = পান গাছ সারিবদ্ধ ভাবে লাগানো হয়। এক একটি সারিতে প্রথমত মূল গাছ ছ'ইঞ্চি ছাড়া লাগানো হয়। পরে মূল গাছ থেকে যে শাখা (কড়ম বা কলম) জন্মায় সেগুলিকে মূল গাছের সামনের দিকে ছ'ইঞ্চি অন্তর সমান্তরালভাবে

লাগানো হয়। এই মূল গাছের সারিটিকে বলে শিরগাছ বা শিরপাকা এবং কলম গাছের সারিটিকে বলা হয় কড়ম পাকা।

- ডেঁপি = পান গাছের প্রতিটি গাঁট থেকে একটি করে পাতা পড়ে। পাতা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে পাতার বৃন্তমূল থেকে যে ক্ষুদ্র শাখা বা পাতা জন্মায় তাকে ডেঁপি বলে। এগুলি ভেঙে না দিলে গাছের সমস্ত তেজ এরাই খেয়ে ফেলে, পাতা বড়ো হয় না। কোথাও একে ডেঁপি ভাঙা কোথাও গেঁজি ছাঁটা বলা হয়।
- টানা = পান গাছ চাল ফুঁড়ে গেলে রোদের তাপে গাছ পুড়ে যাবে। তাই গাছ গুলিকে নামানো হয়। এই পদ্ধিতিকে বলা হয় টানা। টানার সময় গাঁটের শিকড় গুলিকে পাটকাঠি থেকে ছাড়ানো হয়।
- বাঁধা = টানার পর পান গাছের কাণ্ড গুলিকে বিশেষ কায়দায় ঘুরিয়ে দড়ির গোছার মত করে মাটিতে ফেলে জন দিয়ে খাড়ি গুলিকে একসাথে বাঁধা হয়। এই পদ্ধিতিকে বাঁধা বলে। একে খাড়ি ফেলাও বলে।
- দোলন = অনেক সময় টানার পর বাঁধা হয় না। বিশেষত বর্ষার শেষে আশ্বিন কার্তিক মাসে এক পশলা ভারি বৃষ্টিতে পান গাছের গোড়ার মাটি কাদা হয়ে থাকলে খাড়ি পচার সম্ভবনা থাকে। তাছাড়া বর্ষায় পানের দাম কম থাকায় চাষিরা গাছে অনেক পান রেখে দিতে চান। তাই গাছ চাল ফুঁড়ে গেলে গাছ নামানো হলেও মাটিতে ফেলা হয় না। গাছ গুলিকে দুলিয়ে একাধিক গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতিকে বলে দোলন।
- খাড়ি মচকানো = পান গাছের কাণ্ডকে খাড়ি বলে। বাঁধা বা খাড়ি ফেলার সময় অসাবধানতায় খাড়ির দুটি গাঁটের মাঝখানে চাপ পড়ে মুচকে যেতে পারে। এতে গাছ দুর্বল হলেও মরে না।
- আংরা = পান গাছের গোড়ায় রস বেশি হলে খাড়ি প্রথমত ফেটে যায়, পরে পচন ধরে। খাড়ি পচে কালো দাগ পড়ে গেলে তাকে আংরা বলে।
- জন ২ = দক্ষিণের চাষিরা চাষের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন বা মজুর বলে থাকে।

চার

এবার আসা যাক হাওড়া জেলার পানচাষিদের বুলি বা কথ্যভাষার বাক্ বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে। এখানে ভাষার ধ্বনি বা রূপগত বিচার আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা পানচাষিদের ভাব বিনিময় বা তাদের ভাষা-সংযোগের কোড গুলির সন্ধান করব। বিষয় অনুসারে এই বাক্ বিচিত্র্যের নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে—

বিষয় ঃ পানের বরজ সাজা

রতিকান্ত এবছর দশ কাঠা জমি ভরাট করেছে পান চাষের জন্য। সাধারণত বর্ষায় শ্রাবণে পানের বরজ সাজা বা নির্মাণ করা হয়। বরজ সাজায় খরচ অনেক। তাই মাস দুই আগে

থেকে মিস্ত্রি দেখে তার কথা মত কাঠ-বাঁশ, জি.আই.তার,(আট-দশ-বারো-চোদ্দ নাম্বার) পিচে, খড়, নারকেল পাতা, শুকনো নারকেল মোচা, কাতা দড়ি ইত্যাদি যোগাড় করে রেখেছে। নতুন কাটা পুকুরের এক কোণে বাঁশ পচাতে দিয়েছে। রবীন মণ্ডলকে বলে রেখেছে বীচ পানের জন্য। তিন হাজার পাতা বসলেও আরও পাঁচশো পাতা হাপোর দিয়ে রাখতে হবে। কোনো গাছ না হলে কার্তিকে হাপোরের চারা বসিয়ে তা পূরণ করতে হবে। পাঁজি দেখে দিনক্ষণ মিলিয়ে সেই মত লোকও দেখে রেখেছে। তার প্রস্তুতি দেখে প্রতিবেশি নিমাই বিলে-

সাজবি বটে, কিন্তু এবছর বাজার একদম পড়া।

রতিকান্ত। নেমে যখন পড়েচি তখন আর ওসব ভেবে কি করব। কপালে যা আছে তাই হবে।

নিমাই। তা তোর দু-পাকা সেজে উঠতে উঠতে এখন এক বছর। নতুন পানে না হোক পরের বছর পুরোনো পানে ঠিক বাজার পেয়ে যাবি।

রতিকান্ত। সেটাই তো চিন্তার নিমাই দা। সাজারই এত খরচ, তারপর এক বছর ভর মাটি ধরানো, পাগড়ি লাগানো, পাই কোপানো, জল দেওয়া, পাঁক দেওয়া, খোল দেওয়া, পাট করা—সব করে যেতে হবে।

নিমাই। তাছাড়া ধর জিনিস পত্রের দাম হুহু করে বাড়চে। চার'শ টাকার খোল আট'শ টাকা, এক'শ কুড়ি টাকার পাগড়ি সাড়ে তিন'শ-চার'শ, জন দু'শ থেকে তিন'শ, পিচে দেড়'শ থেকে ক'দিনেই তিন'শ। একবার বাড়লে কি আর কমে!

রতিকান্ত। যা বাজার এখন দু-তিন হাজারে পান বেচা লস। বাংলাদেশ, উড়িষ্যা না ঢুকলে বাজার চাগবে না।

বলতে বলতে রতিকান্ত তাড়া লাগায় মহেশ ও হরেনকে। চাষের সময় অনেক চেষ্টায় দুটো জন পেয়েছে। পরশু থেকে বিজন মিস্ত্রি বরজ সাজতে লাগবে। তার আগে ঠাং-কাঠ, চ্যালা-কাঠ ও ডগলার গাঁট মেরে, গা মুছে রাখতে হবে। পরিমাপ মতো তার কাটা, চুণ্ডরি তোলা, গনাগুনতি উবি কেটে গোড়া ছুঁচ করা সব রেড়ি রাখতে হবে। মাল রেড়ি থাকলে বাঁশ পোঁতা, তার খাঁটানো দুদিনেই হয়ে যাবে। তারপর চাল ছাইতে যেকদিন যায়। আসছে মঙ্গলবারে ব্রাহ্মণ ডেকে পুজো করে পাতা বসাবে।

ভাষার বোধগম্যতা নির্ভর করে কথক ও গ্রাহকের সমাজ সংগঠন ও বিষয় অনুসারে তাদের ভাষা জ্ঞানের পরিধির উপর। হাওড়া জেলার পানচাষিদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করেন। আবার ধান চাষ প্রত্যেক চাষির কিছু না কিছু থাকে কিন্তু সকল চাষির পানের চাষ বা পানের বরজ থাকে না। ধান ও পান দুই কাজেই যুক্ত এমন মজুরের সংখ্যাও বেশি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পান চাষের কাজে যুক্ত মজুর ও চাষি মিলে গ্রামের মধ্যেই স্বতন্ত্র একটা সমাজ সংগঠন গড়ে তোলে। জীবিকা অনুসারে এরকম ছোট ছোট সমাজ সংগঠন গ্রামের মধ্যে অনেক থাকতে পারে। যেমন কোড়া বা মাটি কাটার দল। হোগল বা

শরখড়ি কাটার দল। ডেকরেটর বা মঞ্চ বাঁধার দল। স্বভাবতই সীমিত সংখ্যক ভাষা কোডের দ্বারাই এরা ভাষা সংযোগ করে থাকে। সেদিক থেকে এদের ভাষাজ্ঞানের পরিধি সীমিত। উপরের বিবরণ ও বুলি দেখে বলাই যায়- এদের বুলি সঙ্কুচিত। পানচাষের সঙ্গে যুক্ত না হলে উক্ত বাক্যগুলির লক্ষণার্থ বোঝা সম্ভব নয়। নিচে কোডগুলি চিহ্নিত করা হল—

- সাজা = নির্মাণ করা। পানের বরজ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। পানচাষিদের ভাষায় সাজা শব্দের আরও কতকগুলি অর্থ আছে।যেমন-
- সাজা২ = পানের খিলি সাজা বা পান, সুপারি ও নানা ধরনের মশলা সহকারে পানকে মোড়া।
- গোছ/সাজা৩ = পান পাতা ভেঙে এনে সদর বারান্দা বা ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় ছোট-বড়ো পান এক সাথে মেশানো হয়। তারপর বড়ো থেকে ছোট অনুসারে ৩২টি বা ৫০টি পানের গোছ সাজাতে হয়।
- গাছি সাজানো৪ = পান গোছানোর সময় এক একটি গোছ পানের ঝোড়া বা দেওয়ালের গায়ে পরপর সাজিয়ে রাখা বোঝায়।
- পুরোনো পান = পান পাতার আকৃতি, গঠন, ফলন ঋতু বৈচিত্র্যে বদলে যায়। এই ঋতু বৈচিত্র্য অনুসারে পানের নাম ভাষাবিজ্ঞানের রেজিষ্টার হিসাবে ধরা যেতে পারে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে যে পান ফলে তা না ভেঙে শীত বা বসন্ত পর্যন্ত রেখে দেওয়া হলে তাকে পুরোনো পান বলে।
- নতুন পান = বসন্তে দক্ষিণা বাতাস পেলে শীতের সঞ্চিত তেজ নিয়ে পাতলা ছুঁচালো বড়ো বড়ো পান ফলতে শুরু করে তাকে নতুন পান বলে।
- পেনেজ পান = আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষায় পান গাছ যত বৃষ্টিতে ভিজবে, গোড়ায় রস পাবে ততই বড়ো বড়ো গোল গোল থালার মত পান ফলবে, এই সবথেকে বড়ো আকৃতির পান পেনেজ পান।
- আগাল পান = কার্তিকে শিশির পড়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডা নামতে শুরু করবে, এই সময় পানের পাতা যেমন ছোট হবে তেমনি পাতার ধারগুলি হবে কোঁচানো, স্বাদে ভীষণ ঝাল। কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের এই পান আগাল নামে পরিচিত।
- কটকে পান = পৌষ-মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে পানের ডগা কুঁকড়ে যায়, পাতা বের হতে না হতেই খসে পড়ে। যেপাতা গুলি থেকে যায় সেগুলি একেবারে ছোট কড়ি কড়ি, তাই এগুলিকে বলে কটকে পান।
- নারকেল মোচ = নারকেল গাছের ফুল ঝরে যাবার পর যে খোল বা ঢাকা অংশটি থেকে যায় তাকে মোচ বলে। এই মোচ জলে ভিজিয়ে রেখে তাকে সরু সরু ভাবে চেরা হয় যা বেড়া বাঁধার কাজে লাগে।
- কাতা দড়ি = নারকেল ছোপড়ার দড়ি। বরজ সাজতে ঠ্যাং-কাঠ বাঁধা, খড়ের বেড়া ঝোলানো ইত্যাদি কাজে কাতা দড়ির ব্যবহার হয়।

- হাপোর = এক জায়গায় নরম মাটিতে অনেক বীচ পান পুঁতে চারা তৈরি করা। যত পাতা বসানো হয় তত গাছ সাধারণত হয় না। অতিবর্ষণে পানের কাণ্ড পচে যেতে পারে, পাতা রোদে পুড়ে যেতে পারে। হাপোরের চারা তুলে সেখানে বসানো হয়।
- মাটি ধরানো = শ্রাবণে যে পান বসানো হয় ভাদ্র-আশ্বিনে তা থেকে নতুন গাছ হয়। বর্ষায় গোড়ার মাটি ধুয়ে যায় তাই আশ্বিন-কার্তিকে নতুন গাছের গোড়ায় সরিসা খোল দিয়ে মাটি ধরানো হয়।
- পাগড়ি লাগানো = কার্তিক-অগ্রাণের মধ্যে নতুন পানের চারা শিশির পেয়ে হঠাৎ বেড়ে ওঠে। মাটিতে পড়ে শির গাছ যাতে বেঁকে না যায় তার জন্য প্রতিটি গাছে পাটকাঠি লাগানো হয়।
- পাট করা = পাট করা বলতে পরিপাটি বা পরিচর্যার কথা বলা হয়। পান অতি সুখি গাছ। গাছের গোড়া সর্বদা পরিস্কার রাখতে হয়। ডেঁপি ভাঙা, ন-ধরা, টানা, বাঁধা, নিয়মত জল দেওয়া, মাটি দেওয়া, পাঁক দেওয়া, চালে খড় চাপানো, কখনো আবার খড় পাতলা করে দেওয়া, বেড়া দেওয়া ইত্যাদি কাজকে পাট করা বলা হয়।
- চাগা = সাধারণত বাজার দর প্রসঙ্গে বলা হয়। পানের বাজার দর কম হলে পড়া/মরা এবং বাজার দর বাড়তে থাকা বোঝাতে চাগা শব্দের ব্যবহার হয়।
- গাঁট মারা = বাঁশের গাঁট সাফ বা পরিস্কারের কথা বলা হয়। পান গাছ লাগানো হয় সারিবদ্ধ ভাবে। প্রতি সারিতেই তিন হাত ছাড়া ঠ্যাং-কাঠ পোঁতা হয়। গাঁট মারা না থাকলে পাট করার অসুবিধা হয়।
- মোছা = বাঁশ চেলা বা ফালি করলে ধার গুলো হয় ধারালো। ধার চাঁচা না হলে গায়ে লাগা মাত্র কেটে যাবে। তাই ঠ্যাং-কাঠ বরজে লাগানোর আগে কাঠের দুধার কাটারি বুলিয়ে নিতে হয়।
- চুঙরি তোলা = নারকেল মোচের কথা আগেই বলা হয়েছে। নারকেল মোচ কাস্তে দিয়ে বিশেষ এক পদ্ধতিতে চেরা বা তোলা হয়। এই চেরা অংশ গুলিকে চুঙরি বলে। প্রাধানত বেড়া বা চালের বাতা বাঁধার জন্য চুঙরি ব্যবহার করা হয়।

পাঁচ

পানচাষিদের ব্যবহৃত দুষ্পাপ্য কিছু শব্দের উল্লেখ করে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। সময়ের সাথে সাথে পান বরজ সাজা থেকে পরিচর্যার ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় দেখেছি শুধু কাঠ-বাঁশেই বরজ সাজা হত। তারের ব্যবহার ছিল না। ঠ্যাং-কাঠ সারিবদ্ধ ভাবে পোঁতা হত না, হত ক্রশ বা গুণিতাকারে। চালের **বাতা** হিসাবে ফেলা হত বেশনি বাঁশের লম্বা লম্বা **বাটাম** বা **ছুঁচ**। **জোড়া গাছি** বা দুটো করে গাছের সারি একসঙ্গে বাঁশের ডগলা দিয়ে টান দেওয়া হত। নারকেল পাতা চিরে **ছামাড়** বেঁধে

উপর-নীচে উল্টভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হত বেড়া। পাটকাঠির অভাবে শরখড়ি, ধঞ্চে গাছের কাণ্ডও ধরানো হত পান গাছে। পান মূলত জলজ পাতা। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিদিন গাছে জল দিতে হয়। পানের বরজের সাথে পুকুর থাকা তাই আনিবার্য। জল তোলার জন্য ব্যবহার করা হত মাঝারি ও বড়ো আকারের **বারাঙ্**। কোমরে চট জড়ানোর সত্ত্বেও কালসিটে দাগ পড়ে যেত বারাঙ খিঁচতে খিঁচতে। জৈবসার সরিষার খোলই একমাত্র ব্যবহার করা হত পানের খাদ্য হিসাবে। খাড়ি পচা বা আংরা হলে প্রতিষেধক হিসাবে কলি চুন ফুটিয়ে পাইয়ের দুধারে ছড়িয়ে দেওয়া হত। বর্ষা কেটে গেলে পাই কুপিয়ে চালের খড় সরিয়ে ফাঁকা করে মাটিতে রোদ খাওয়ান হত। পানের বাজার দর হিসাব করা হত পাতা হিসেবে। তিন পাতা, (অর্থাৎ তিন গোছ = ১০০ পানের দাম এক টাকা, ১০,০০০ পানের দাম ১০০ টাকা) সাড়ে-তিন পাতা, দুপাতা, আড়াই পাতা, ইত্যাদি। হাওড়া জেলার পানচাষিদের পান বাজারে আনতে দুর্গতির শেষ ছিল না। মাথায় মোট নিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে পৌঁছাতে হত পাকা রাস্তায়। এঁটুলে মাটির কাদায় পথ-ঘাট ছিল দুর্গম। প্রতিটি পানের মোটের গায়ে **ছোটের** তলায় তালপাতায় চাষির নাম ও মোটে পানের পরিমাণ লিখে চাষি **আড়তে** পান পাঠাত। তালপাতার চিরকুট না থাকলে আড়ৎদার বলত **বিনা জাতে**। বাজার পড়া হলে সরিষা খোলের সঙ্গে ধানের কুঁড়োসহ খুদ মিশিয়ে দেওয়া হত, যাতে খোল কম লাগে। বাজার ভাল থাকলে চাষি নরম কচি পাতাও ভেঙে ফেলে, কারণ নানা কারণে পানের বাজার বেশি দিন স্থির থাকে না। তখন এক দিন আগে পান ভেঙে ছোট-বড়ো পান মিশিয়ে জল ছিটিয়ে **জাগ** দিয়ে রাখা হয়, যাতে নরম পান শক্ত হয়। পানের বরজ পুরোনো হলে মাটিতে খাড়ি জমতে জমতে উঁচু হয়, গাঁট থেকে ছোট ছোট পাতা বেরিয়ে গাছের সব তেজ খেয়ে নেয়, তাই **জেবো** কেটে গাছের গোড়া সাফ করতে হয়। এসবের অনেক কিছুই এখন বদলে গেছে।

বাঁশের পুতুলনাচের পর যখন তারের পুতুলনাচ এল তখনি গ্রামে গ্রামে কাঠ-বাঁশের বদলে তারের বরজ সাজা শুরু হল। দেখে আশ্চর্য হলাম কালবৈশাখীর ঝড়ে বরজ পড়ে গেলেও দুদিক থেকে তারে টান দিলেই বরজ খাড়া উঠে দাঁড়ায়। নারকেল পাতার বেড়ার বদলে আমন ধানের খড়ের আঁটি ভেঙে সরু সরু করে তারে ঝোলান হল। কাতা দড়ির বদলে এল প্লাসটিক বা নাইলনের দড়ি। সরিষা খলের ব্যবহার থাকলেও যুক্ত হল গরুর হাড়ের গুঁড়ো, রাসায়নিক সার ও নানা ধরনের ভিটামিন এবং কীটনাশকের ব্যবহার। পানের গোছ ৩২ থেকে হল ৫০ শে। হিসাব করাও শুরু হল প্রতিটি পানের দাম ধরে। কলসি, বারাঙ্ উঠে গেল, বাড়ি বাড়ি এল তিন ঘড়া পামসেট ও তিন ইঞ্চি, চার ইঞ্চি মাপের একশো, দুশো, তিনশো ফুট জল দেওয়া পাইপ। ইদানিং পানের বরজ ঘেরা হচ্ছে মশারির মত প্লাসটিকের ছিদ্র যুক্ত থান দিয়ে। ট্রলি ভ্যান থেকে ইঞ্জিন ভ্যান থেকে তিন চাকা ট্রেকার এখন চাষির বাড়ি থেকেই পানের মোট তুলে নিয়ে বাজারে পৌঁছে দেয়। ফোনে আড়ৎদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাষিরা জানতে পারে বাংলাদেশ, উড়িষ্যার পাইকাররা বাজারে আসছে কিনা। এসবের ফলে পানচাষিদের ভাষা কোডেও অল্প বিস্তর

পরিবর্তন ঘটছে। আবার হারিয়ে যাচ্ছে পুরাতন ভাষা কোড। নিচে দুষ্পাপ্য কিছু ভাষা কোড-এর বিবরণ তুলে ধরা হল।

- বাতা = চালের বাতা। ছাউনির পিচে, খড় ধরে রাখার জন্য দুই সারির মাঝ বরাবর চালের বাতা ফেলা হয়। তাছাড়া শির পাকা ও কড়ম পাকা আলাদা রাখার জন্যও পাটকাঠির বাতা ফেলতে হয়। সাধারণত চুগুরি দিয়ে বাতা বাঁধা হয়।
- বাটাম বা ছুঁচ = লম্বা বাঁশের পাতলা সরু ফালি। বাঁশের বরজে ছুঁচের ব্যবহার হত, তারের বরজে আর দরকার হয় না।
- ছামাড় = বেড়া দেবার কাজে ব্যবহার করা হত। বাঁখারি পেতে তার উপর নারকেল পাতা বা খড় বিছিয়ে কাতা দড়ি দিয়ে বেঁধে ছামাড় তৈরি করা হত।
- বারাঙ্ = লম্বা আকৃতির বিশেষ ধরনের কলস। আকৃতি অনুসারে একটি বারাঙ্-এ ৪০-৫০ লিটার জল ধরতে পারে।
- পাতা = পানের মূল্য মান। ৩২ টি করে পান নিয়ে হত এক একটি গোছ। সাধারণত এক গোছকে এক পাতা হিসাব করা হত। তারপর তার হিসাব করা হত এক টাকার মূল্য মান ধরে। এক টাকায় এক গোছ পান মানে এক পাতা। অর্থাৎ তিন গোছ পান (৩২ গুণিতক তিনগু ৯৬ এবং চারটি পান গলন ধরে ১০০) পানের দাম তিন টাকা। ১,০০০ পানের দাম ৩০ টাকা এবং এক মোট অর্থাৎ ১০,০০০ পানের দাম ৩০০ টাকা।
- ছোট = খড় পাকিয়ে অথবা শুকনো কলা পাতার ডাঁটা জলে ভিজিয়ে ছোট বানানো হত। পানের মোট বাঁধা হত এই ছোট দিয়ে।
- বিনা জাতে = আড়তে কোনো মোটে চাষির নাম এবং পানের পরিমান লেখা না থাকলে আড়তদাররা তাকে বিনা জাতে ঘোষণা করত।
- জাগ = জাঁকে রাখা। নরম পানকে জল ছিটিয়ে জাঁকে রাখা হয়। ঘোষীভবনের ফলে জাঁক জাগ হয়েছে।
- জেবো কাটা = পান গাছের প্রতিটি গাঁট থেকেই শিকড় গজায়। শিকড় মাটিতে পড়লে সব গাঁট থেকেই গজায় নতুন শাখা ও পাতা। গাছের গোড়া এভাবে শাখা ও পাতা গজানোকেই জেবো বলে। এগুলি কেটে না দিলে উপরের পাতা বড়ো হয় না। পান পাতার দাম আকৃতি ও মোটা-পাতলার উপরে নির্ভর করে। পাতলা ও বড়ো পানের দাম সব ঋতুতেই বেশি।

গ্রন্থঋণ

১. *ভাষা ও সমাজ* : মৃণাল নাথ; নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা : হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা। লেখক দীর্ঘদিন পান চাষের সঙ্গে পরিচিত। লেখাটি প্রধানত অভিজ্ঞতা নির্ভর। আমরা আগেও বলেছি বিশেষত পানচাষিদের প্রসঙ্গে শব্দ বৈচিত্র্য বা ভাষা কোডের দিক থেকে কিছু পার্থক্য হাওড়া জেলার উত্তর-দক্ষিণ বা পশ্চিমের চাষিদের মধ্যে আছে।